আবার তারানাথ

কাহিনি: ব্রিজিৎ কর

আবার তারানাথ

ত্রিজিৎ কর

Made with □ by টেলি বই □□

ইপাবঃ □ বংবই।

PDF on বর্ণপরিচয়।

created from facebook ⬇

Vut Vutum

Collect More Books >
From Here

সূচীপত্র

1. আবার তারানাথ
    1. Acknowledgment
    2. Contributor
    3. Disclaimer
2. লেখকের নিবেদন
3. আবার তারানাথ
    1. //১//
    2. //২//
    3. //৩//
    4. //৪//
    5. //৫//
4. আবার তারানাথ (দ্বিতীয় পর্ব)
    1. //৬//
    2. //৭//
    3. //৮//
    4. //৯//
    5. //১০//

5. আবার_তারানাথ(অন্তিম পর্ব)
    1. //১০//
6. শেষ পৃষ্ঠা

Acknowledgment

Join us to Volunteer in proofreading, Get more books like this.

For any ideas/suggestions on books, you would like to get implemented go to @bongboi

This eBook is built from Facebook posts. No intention for copyright infringement.

Contributor

The content of the books are on facebook. We do not own any content and/or have any connection to those groups. To get more help us, join as a Volunteer on bongboi.

Disclaimer

⚠

Tele Boi Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976: allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or

personal use tips the balance in favour of fair use.

The content of the book is available on facebook groups.

Do Not redistribute in a commercial way.

Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors. Or in this case by liking their original post.

লেখকের নিবেদন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পগুলো পড়ে আমি কখনো শিহরিত হয়েছি,কখনো ভীষণ ভয় পেয়েছি, কখনো আবার গল্পের শেষে একটা অদ্ভুত মন কেমন পেয়ে বসেছে। এই গল্পটি এই দুজনের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ

করলাম,তাদের লেখার বিন্দুমাত্র গুণও যদি এ লেখা পেয়ে থাকে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

সময়ের অভাবে দ্রুত টাইপিং এর ফলে যদি কোথাও কিছু বানান ভুল হয়ে থাকে সেটা মার্জনা করে দেবেন আশা করি। আর এর আগের দুটি গল্পেরই অনেক কমেন্টের রিপ্লাই দিতে পারিনি সময়ের অভাবে। সেই জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি,সকলে দয়া করে পুরো গল্পটা পড়ে কেমন লাগলো জানাবেন।

আবার তারানাথ

কাহিনী: ত্রিজিৎ কর

//১//

চারিদিকে মিশ কালো অন্ধকার, কিছুই প্রায় ঠাওর করা যাচ্ছে না। কিন্তু এই গভীর অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষন চেয়ে থাকলেই বোঝা যায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি কোনো একটি নদীতটে। কিছুদিন আগেই জঙ্গলের প্রায় এক প্রান্তে এই জায়গাটিতে ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। এখানে দাঁড়ালেই পাশ দিয়ে বহমান নদীর শান্ত বয়ে চলার শব্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু আজকের পরিবেশ সামান্য আলাদা। আজ নদীতে জলের বেগ সাধারণ দিনের চেয়ে বেশি। প্রবহমান বাতাসের বেগও আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালেও বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের দেখা মিলছে কখনো সখনো। এরই মধ্যে যে নদীতটে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে ভালো করে চোখ রাখলেই বোঝা যায় এক দীর্ঘকায়

জটাজুটধারী ব্যক্তি নদীতটের এক প্রান্তে বসে আছে। তার সামনে হাত পাঁচেক দূরে রাখা আছে একটি শবদেহ। ভালো করে সেই দিকে চেয়ে দেখুন বুঝতে পারবেন সেই দীর্ঘকায় জটাজুটধারী ব্যক্তি খুব সম্ভবত কোনো রকম তন্ত্র মন্ত্র সাধনা করছেন। তার সামনে রাখা আছে একটি নর করোটি, একটি সদ্য মৃত শৃগালের দেহ,দুটি দীর্ঘকায় হাড় এবং আরো বেশ কিছু ভয়াবহ সরঞ্জাম। ব্যক্তিটি সম্ভবত কোন তন্ত্র সাধক। একমনে তিনি কি সব মন্ত্র পড়ে চলেছেন ক্রমাগত এবং কিছুক্ষণ পরপরই কি এক রকমের ছাই ছুড়ে দিচ্ছেন শবদেহটির দিকে আর তাতেই কেঁপে কেঁপে উঠছে শবদেহটি।

চুপ; আরো কিছুক্ষন এইভাবে নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করুন, নদীর শীতল হাওয়া আপনার শরীরে লাগুক, অন্ধকার আরো গাঢ় হোক। তারপর এই এখন, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন সেই সাধকের মন্ত্রোচ্চারণ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে? চারপাশে নীরবতা ভেদ করে সেই ভয়ংকর মন্ত্রোচ্চারণ সৃষ্টি করছে এক নারকীয় পরিবেশ। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন সাধকের থেকে পাঁচ হাত দূরে থাকা সেই শবদেহটি কি প্রচন্ড রকম কাঁপছে আর মাঝে মাঝেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে একটা চাপা গোঙানির শব্দ! স্থির হোন, নড়বেন না, চুপটি করে দেখুন সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে সাধকটি পাগলের মতো মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। তারপর একসময়... ওই যে... ওই যে তিনি চিৎকার করে

উঠলেন-

-"জেগে ওঠো... জেগে ওঠো হে প্রগাঢ় তমসময়ী... হে বজ্র ডাকিনী জেগে ওঠো! তোমার ধুর্ততার জন্য উৎসর্গ করেছি শৃগালের রক্ত, তোমার যৌবনের জন্য উৎসর্গ করেছি সদ্য রজস্বলা রমণীর পাঁজরের হাড়, আরো শক্তিশালী হওয়ার জন্য এই উৎসর্গ করলাম সাধকের বুকের রক্ত (ভালো করে চেয়ে দেখুন একটি ধারালো ছুরি দিয়ে সাধকটি নিজের বুকের কাছটা কেটে সেই রক্ত ছিটিয়ে দিল শবদেহটির দিকে) এইবার... এইবার জেগে ওঠো!"

ঠিক এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশ ভেদ করে চোখের নিমেষে একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ নেমে এল একেবারে শবদেহটির বুকে। কানে হাত দিন,কানে হাত দিন...ওঃ কি ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের শব্দ! তারপর কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ।শবদেহটি দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনে। এইবার ভালো করে চেয়ে দেখুন, জানি যা দেখছেন বিশ্বাস হবে না। সারা শরীরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে কিন্তু তার মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে শবদেহটি। তারপর ঐ যে... ঐ যে সে খিল খিল করে হাসছে। তার হাসির সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠছে, ঝড়ের হাওয়ার গতি আরো বাড়ছে। ওই শুনুন সাধকটিও পাগলের মতো হাসতে হাসতে বলছে- -"সার্থক! সার্থক! আমার সাধনা সার্থক

হয়েছে... জেগে উঠেছে... বজ্র ডাকিনী জেগে উঠেছে... এইবার নলহাটির ছেলেরা বউয়েরা তোমরা তৈরি হও! ভয়ঙ্কর মৃত্যু তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে!

ব্যাস; আর নয়। আর এখানে থাকা আমাদের উচিত হবে না। আসুন এইবার আমরা এই নদীতট থেকে প্রস্থান করি। শুধু প্রস্থানের আগে সেই জগদীশ্বরের কাছে একবার অন্তত প্রার্থনা করুন যে বিভীষিকার জন্ম আপনি নিজের চোখে হতে দেখলেন, তার হাত থেকে নলহাটির ছেলে বউয়েরা যেন মুক্তি পায়।

//২//

বিকাল। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি আর কিশোরী যথারীতি তারানাথের মটলেনের বাড়িতে বসে সদ্য ধোঁয়া ওঠা ফুলুরিতে কামড় বসাচ্ছি।তারানাথও ফুলুরি শেষ করে বেগুনিতে একটা কামড় দিয়ে বলল- "আমি জানতাম তোমরা আজ আসবে। এই সমস্ত বৃষ্টির দিনে গল্প শোনার নেশা একবার যাদের হয়েছে তাদের পক্ষে এইসব দিনে বাড়িতে বসে থাকা প্রায় অসম্ভব।"

-"গল্প! বলেন কি! আপনার তো সব সত্যি ঘটনা!"- কিশোরী ফুট

কাটল।

-"তারানাথ তান্ত্রিকের বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলার প্রয়োজনও নেই। আমি এতদিন যা যা তোমাদের শুনিয়ে এসেছি সবই সত্য ঘটনা। এক বর্ণ মিথ্যা নেই তাতে..."- একটু রেগে গিয়েই বলল তারানাথ।

তারানাথের রাগ কমাতেই আমি বললাম-" তা কেন! বিশ্বাসই যদি না করি তাহলে প্রত্যেকবার আসি কেন! কিশোরীর কথা ছাড়ুন তো। ও ওরকম বলেই থাকে।"

আমার কথা শুনে তারানাথ হাসলো। তারপর বলল -"তোমরা বিশ্বাস করলে কি করলে না

তাতে আমার বয়েই গেল। যে সব ঘটনা আমি আমার নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি তার সত্যাসত্য কি তোমাদের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করবে? তবে তোমরা আসলে আমার ভালো লাগে। আমার বয়স হয়েছে, চোখের জ্যোতিও কমে এসেছে। এক কালে এই চোখ দিয়ে দেখে মানুষের জন্ম মৃত্যু পর্যন্ত বলে দিয়েছি... আর আজ! সময়ের করালগ্রাস মানুষের থেকে সমস্ত কিছুই কেড়ে নেয় এক এক করে। এই দেখো না তিন দিন ধরে কোনো খদ্দের আসেনি। এখন ভাবি বুঝলে যৌবনের শুরুতে যদি তখন এই জ্যোতিষ চর্চা, কুণ্ডলীবিচার

নিয়ে না পড়ে প্রকৃত সাধনা করতাম তাহলে জীবনটা আজ কতো অন্যরকমই না হত!"

তারানাথ জীবনের বহু ঘটনাই আমরা তারানাথের মুখ থেকে এর আগে শুনেছি।তার ছোটবেলায় জ্বরাসুরের কবলে পড়া, যৌবনে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়া, তারপর মহাডামরতন্ত্রে সিদ্ধ মাতু পাগলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। শেষমেষ অসমাপ্ত শবসাধনা এবং যোগিনী মধুসুন্দরী দেবীর থেকে কিছু বিশেষ ক্ষমতার প্রাপ্তি। এই সমস্ত রোমাঞ্চকর ঘটনাই তারানাথের নিজের মুখ থেকে আমাদের শোনা। আজকের খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ হওয়ার পরই একটা পাসিং শো(তারানাথের প্রিয় সিগারেট) এর প্যাকেট তারানাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম-" আজ তাহলে কিছু শোনান। এমন একটা বিশুদ্ধ গল্পের পরিবেশ নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।"

তারানাথ একটা সিগারেটে মৌজ করে টান দিতে দিতে বলল-" কত ঘটনার কথাই তো তোমাদের বলেছি। আজ কী নিয়ে শুনতে চাও বলো?"

-"আপনাদের এই তন্ত্র-মন্ত্রের ডাকিনী যোগিনী দের ব্যাপারে তো অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনি। যোগিনীদের ব্যাপারে তো আপনার কাছ থেকেই অনেক কিছু জেনেছি। আজ বরং ডাকিনীদের

নিয়ে কিছু বলুন না। আপনি কখনো নিজের চোখে সেরকম কিছু দেখেছেন?"- কিশোরী জিজ্ঞেস করল।

সিগারেটে শেষটানটা দিতে দিতে চোখ বন্ধ করে তারানাথ বলল- "ডাকিনী! কেন দেখব না! নিশ্চয়ই দেখেছি। আমার জীবনের প্রথম শবসাধনার সময়ই তো তাদের দেখেছিলাম। তারা একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর আবার ছলনাময়ী। পথ না জানলে তাদের হাত থেকে নিস্তারের উপায় নেই। তবে ডাকিনী বললেই আমার প্রথম মনে পড়ে বজ্র ডাকিনীর কথা। আমার জীবনের সবথেকে ভয়ংকর অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটা হল সেই বজ্র ডাকিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া। ওঃ সেই ঘটনা জীবনে ভোলার নয়!"

-"বজ্র ডাকিনী! সেটা কি বস্তু? সেই ঘটনাটাই বলুন তাহলে..."

তারানাথ শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা পাশে থাকা নারকেলের মালায় গুঁজে রেখে চোখ বন্ধ করে একমনে কী একটা যেন ভাবতে থাকলো। আমরা জানি তারানাথ আসলে এখন পুরো গল্পটা মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে। একটুক্ষণ পরেই চোখ খুলে সে বললো -"শোনো তাহলে..."

এ ঘটনা যখনকার তখন আমার সদ্য মেয়ে হয়েছে। স্ত্রীকে নিয়ে আমার গ্রামের পৈতৃক বাড়িতেই আছি। আমার নামডাকও তখন খুব একটা কম না। আশে পাশের গাঁয়ের থেকে রোজই কেউ না কেউ মাদুলি করাতে আসে, কেউ কুণ্ডলী বিচার করে নিয়ে যায়, অনেকে আবার হাত দেখাতেও আসে।

তো একদিন দাওয়ায় বসে আছি হঠাৎ এক বৃদ্ধ এলেন। মাঝারি উচ্চতা, মাথায় অল্প টাক, চোখে চশমা, পোশাক-আশাকে একটা আর্থিক স্বচ্ছলতার ছাপ। বৃদ্ধ প্রথমেই আমাকে দেখে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। আমি সেই দেখে কোনরকমে ইতস্তত হয়ে বললাম-" আরে করছেন কি? করছেন কি? আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। এভাবে আমায় লজ্জা দেবেন না।"

বৃদ্ধ আমার কথা শুনে জোড়হাত করে বলল-" ও কথা বলবেন না ঠাকুরমশাই। আমরা হলাম কায়স্থের জাত। সদ্যজাত বামুনের ছেলেকেও গড় হয়ে প্রণাম করা আমাদের সাজে। শাস্ত্রের তো তাই নিদান।"

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম-" শাস্ত্রের নিদান যাই হোক না কেন মনুষ্যত্বের নিদানটাই সবচাইতে ওপরে। আর মনুষ্যত্বের নিদান বলে আমার বাবার বয়সী হয়ে আপনার এই ভাবে আমাকে প্রণাম করাটা

আর যাইহোক আমার কাছে সম্মানের নয়। আর এরকমটি করবেন না কখনো। আপনি আপনার গ্রামের যে বিপদের ব্যাপারে বলতে এসেছেন সেইটাই বলুন না হয়।"

বৃদ্ধটি অবাক হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর বলল-" নাঃ লোকে তাহলে আপনার ব্যাপারে মিছে কথা বলে না। ভগবান তাহলে ঠিক লোকের কাছেই আমায় পাঠিয়েছেন!"

-"ঠিক লোক না ভুল লোক তা পরে বিচার করা যাবে। এখন আপনার মুখ থেকে সমস্ত ঘটনাটা বিস্তারিত শুনতে চাইছি।"

-"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীপতিচরণ তালুকদার। নলহাটি গায়ে এই অধমের বসতবাড়ি। পৈতৃকসূত্রে আমাদের চালের আড়ৎ। আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম, আমার দুই ছেলে এখন আমার তত্ত্বাবধানে সেই ব্যবসা দেখভাল করছে। বড় ছেলেটির বিয়ে হয়ে গেছে, একটি পুত্র সন্তান আছে। ছোট ছেলেটি এখনো অকৃতদার।"

-'হুম... তারপর?"

-"যে আজ্ঞে ঠাকুরমশাই। যে কারণে আপনার কাছে আসা সেই কথাটাই এইবার বলি। আমাদের নলহাটি গাঁয়ে দিন পনেরো হলো একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই আতঙ্কের শুরু হয় দিন

পনেরো আগেই আমাদের গাঁয়ের এক জেলে বিশ্বম্ভর মাইতির মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। বিশ্বম্ভর মারা যায় মাথায় বাজ পড়ে। অথচ কি অদ্ভুত যেদিন ও মারা যায় সেই দিন এক ফোটা বৃষ্টি পড়া তো দূর একটুকু ঝোড়ো হাওয় পর্যন্ত বয়নি! আমরা প্রথমে এটাকে নিতান্তই দুর্ঘটনা ভেবেছিলাম, তেমন গড় করিনি। কিন্তু এর দিন সাতেকের মধ্যেই যখন আরও চারজন গ্রামবাসী একেরপর এক ওরকম অকস্মাৎ বজ্রপাতে মরল তখন আমাদের টনক নড়লো। আপনিই বলুন ঠাকুর মশাই এ কি কোনো সাধারণ কান্ড? মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই হঠাৎ হঠাৎ বাজ পড়ে মানুষ মারা যাচ্ছে! প্রথমটা আমরা একজন বামুনকে দিয়ে একটা শান্তি স্বত্যয়ন মতো করালাম। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হল না ঠাকুর মশাই। তার পরেরদিনই আরো একজন মরল ওই একই ভাবে। তারপর পাশের গাঁ থেকে রোজা ডাকালাম, মন্ত্র পড়ালাম...কত লোক কত চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হল না! এই দু সপ্তাহে সব মিলিয়ে এগারোজন মানুষ অকাল বজ্রাঘাতে মারা গেছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই ব্যাপারটা প্রথমে মানতে চাইছিল না কিন্তু এখন সকলেই বিশ্বাস করছে এটা কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয় এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে নইলে এমন অদ্ভুত ধারা কান্ড ঘটবে কেন? গায়ের মানুষগুলো আতঙ্কে একেবারে গুটিয়ে আছে ঠাকুরমশাই। বিকেলের পর প্রাণ হাতে করে রাস্তায় বের হচ্ছে। আর কিই বা করবে বলুন,ওরা গরীব মানুষ...প্রাণের ভয়ে

বাড়িতে বসে থাকলে তো আর ওদের চলবে না। তাই আপনাকে নিতে এসেছি ঠাকুরমশাই। আমার স্থির বিশ্বাস এই ঘটনার যদি কেউ বিহিত করতে পারে তবে তা একমাত্র আপনিই। ঠাকুর মশাই আপনি যাবেন তো আমার সঙ্গে নলহাটিতে?"

-"হুম; যাবো। আপনার মুখে যা শুনলাম তাতে বোধ করছি আজকে রওনা দেওয়াটাই মঙ্গল হবে।আর বেশি দেরি করা ঠিক হবে না।"

আমার কথা শুনে শ্রীপতিবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি জোড়হাত করে একবার প্রণাম করে বললেন -"চলুন তাহলে এই বেলাই বেড়িয়ে পরা যাক। এখন বেরোলে বিকেলের আগের ঠিক আমরা গায়ে পৌঁছে যাব।"

//৪//

সেইদিন মুখে দুটো অন্ন দিয়ে আমি শ্রীপতিবাবুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। শ্রীপতি বাবুর সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূপতিচরণও এসেছিল। আমাদের কথোপকথনের পুরো সময়টাই সে বাইরে দাড়িয়েছিল। ভূপতিচরণ ভারী অমায়িক লোক, গৌড় বর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, মুখে সবসময় একটা হাসি লেগেই আছে। আমার সঙ্গে তার বেশ ভাব জমে

গেল।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে নলহাটি পৌঁছাতে সময় লাগলো পাক্কা সাড়ে তিনঘণ্টা। স্টেশন ছেড়ে গাঁয়ে পা রাখতেই আমার একটা অদ্ভুত অনুভুতি হলো। চারিদিকে কেমন একটা দমবন্ধ ভাব, গাছে গাছে পাখিরাও ডাকছে না যেন! বুকের মধ্যে একটা চাপা অস্বস্তি দানা পাকিয়ে উঠতে লাগলো। বুঝতে পারলাম এ গাঁয়ে কোথাও কিছু একটা হয়েছে। ভয়ঙ্কর কিছু। তোমরা তো জানোই মধুসুন্দরী দেবীর থেকে এরকম কিছু ক্ষমতা আমি পেয়েছিলাম। এর আগেও যতবারই এমন অনুভূতি হয়েছে ততবারই কোনো না কোনো কালান্তক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। তবে শ্রীপতিবাবুদের এ ব্যাপারে কিছু বললাম না। চুপচাপ চললাম তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। মনের ভিতর কিন্তু কে যেন ক্রমাগত বলে চলল-" ঠিক নেই...ঠিক নেই... কিছু একটা ঠিক নেই!"

সেই দিন রাত্তিরের মতো খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। ট্রেনের যাত্রার দরুন শরীরের ধকল গিয়েছিল। ফলে শুতেই চোখে ঘুম চলে এলো। পরেরদিন সকালবেলায় শ্রীপতিবাবুদের বাড়ির দাওয়ায় আলোচনার আসর বসলো। সারা গাঁ থেকে বহু লোক এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তারা সবাই এই খবর পেয়ে এসেছে যে শ্রীপতিবাবু নাকি এমন একজনকে নিয়ে এসেছেন যিনি নলহাটির এই ভয়ংকর

হত্যালীলার সমাপ্তি ঘটাতে পারবেন। তাদের সকলের মুখেই আশার আলো, বন্যায় ভেসে যাওয়ার আগে সামান্য খড়কুটো ধরে মানুষের বাঁচতে চাওয়ার যে আশা সেই আশার।

আমি মুড়ি আর গুড় খেতে খেতে তাদের সবার কথাই শুনলাম। প্রত্যেকের প্রায় একই কথা বলল। শ্রীপতি বাবুর কথার থেকে বিশেষ আলাদা কিছু তাদের মুখে শুনলাম না। শুধু এইটা জানা গেল যে সবকটা মৃত্যুই ঘটেছে রাতের দিকে আর কোন মৃত্যুরই কোনো প্রত্যক্ষদর্শী নেই। তবে অনেকেই শেষ কয়েকদিন বাজ পড়ার আওয়াজ পেয়ে সেই দিকে ছুটতেই অকুস্থল থেকে একটা আগুনের হল্কা মতো ছুটে যেতে দেখেছে, ব্যাস এতোটুকুই। আমি তাদের সকলের কথা শুনে তাদেরকে সাধ্যমত আশ্বাস দিলাম যে আমার যতটুকু ক্ষমতা তার সবটা দিয়ে চেষ্টা করব এই বিপদ ঠেকাবার। বাকিটা জগদীশ্বরের হাতে।

আলোচনার শেষে সবাই একে একে বেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ করলাম একটি মেয়ে উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামবর্ণা দীর্ঘকায় মেয়েটি কি একটা যেন বলবার জন্য উসখুস করছে। আমি তাকে হাত দেখিয়ে কাছে ডেকে বললাম-" কিছু বলবে মা?"

মেয়েটি কিছুক্ষন আমার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বলল-" ঠাকুর

মশাই আমার নাম রাধারানী। আমি এই গ্রামেই থাকি। আপনি শুনেছি হাত দেখেন। গ্রামের এই অবস্থায় আপনাকে হাত দেখানো ঠিক হবে না আমি জানি কিন্তু তবুও আপনার কাছে কিছু জিনিস জানবার ছিল।"

আমি মৃদু হেসে বললাম-" তুমি যা জানতে চাও তা বলার জন্য হাত দেখার কোনো দরকার নেই মা। তোমার স্বামী বেঁচে আছেন, তার কিচ্ছু হয়নি।'

আমার কথায় মেয়েটি প্রায় ভুত দেখার মত চমকে উঠলো। তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললো-"ঠাকুর মশাই ও ঘর ছেড়েছে প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেল। ও কি আর কখনো ঘরে ফিরবে না? আমি যে রোজ ওর পথ চেয়ে বসে থাকি।"

-"না মা, তোমার স্বামীর আর ঘরে ফেরার সম্ভাবনা নেই। তিনি যে পথ বেছে নিয়েছেন তাতে একবার পা রাখলে আর ঘরে ফেরা যায় না। তুমি বরং তার ফেরার আশা আর কোরো না। বরং হাতের কাজ কিছু জানলে তা করো, আমার মন বলছে সেই পথে তোমার আর্থিক সমস্যা মিটবে।"

আমার কথায় মেয়েটির চোখ ছল ছল করে উঠলো। সে একবার আমার প্রণাম করে বলল-"আপনি যা বললেন তাই করবো

ঠাকুরমশাই। কিন্তু ও যেখানেই থাকুক দীর্ঘ জীবন লাভ করুক এই আশীর্বাদ করুন।"

-"মিথ্যে আশ্বাস তো আমি কাউকে দিই না মা। তোমাকেও দেবো না। সত্যি কথাটাই বলি, আসছে অমাবস্যায় তোমার বৈধব্য যোগ আছে মা। তুমি সাবধানে থেকো। ঐদিন ঘরের বাইরে বেরিয়ো না। সারাদিন নির্জলা উপোস করে রাতে কিছু খেও। এখন এসো।"

মেয়েটি আমার এই কথা শূনে পাথরের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। তার চোখের পাতা পড়ল না, ঠোঁট নড়লো না। এমন ভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর মেয়েটির একসময় মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। মেয়েটির কপালে আরেকটি জিনিস যা সেদিন আমি দেখেছিলাম তা কিন্তু তখনই তাকে আমি বলিনি।"

-"কী দেখেছিলেন?"-কিশোরী প্রশ্ন করল।

-"পতিহন্তারক যোগ।"

-"সেটা কি?"

-"ওই মেয়ে নিজেই তার স্বামীর মৃত্যুর কারণ হবে এ ওর কপালে

স্পষ্ট লেখা ছিল!"

তারানাথের কথা শুনে কিশোরী আর আমি দুজনেই পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকালাম। তারপর দুজনে মিলেই একসঙ্গে বললাম- "তারপর কী হলো?"

তারানাথ মৃদু হেসে উত্তর দিলো-"বলছি শোনো..."

//৫//

এরপর দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে গেল। মাঝে আমি একদিন মহাবন্ধন যজ্ঞ করলাম। মহাবন্ধন যজ্ঞ নিয়ে আরেকখানা ভালো ঘটনা আছে, সেটা আরেকদিন বলব না হয়। আপাতত এটুকু জেনে রাখো কোন বড় এলাকায় অশুভ শক্তির প্রবেশ বন্ধ করার জন্য একজন যজ্ঞ করা হয়। যাই হোক সেই যজ্ঞের ছাই নিয়ে আমি সারা গায়ের চারিদিকে পরিখা বরাবর দন্ডী মতো কেটে দিলাম।

এরপর থেকে দিন চারেক পর্যন্ত আর কিছু ঘটলো না। শ্রীপতিবাবু সহ গ্রামের অনেকেই ধরে নিলেন যজ্ঞে কাজ হয়েছে। আর কোনো দুর্ঘটনাই ঘটবে না নলহাটিতে। কিন্তু আমি নিজে তো ভালো করেই

বুঝতে পারছিলাম যে যজ্ঞতে যে কাজটা হয়েছে তা সাময়িক। নলহাটির আকাশে যে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দানা বেঁধেছে তার প্রতিকার এত সহজে করা যাবে না।

-"আপনি তখনও বুঝে উঠতে পারেননি যে ওই মৃত্যু গুলো একের পর এক কেন ঘটেছিল?"- কিশোরী প্রশ্ন করল।

-"উহু,তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। আর সেটাই তো আমাকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সমস্ত লক্ষণ, সমস্ত ঘটনা পরপর সাজিয়েও ওই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা বা উৎস আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আর সেই কারণেই আমার ভেতরকার অস্থিরতা আরো বাড়ছিল। কিন্তু আমাকে আর বেশী অপেক্ষা করতে হলো না। পঞ্চম দিনের দিন রাত্রিবেলাতেই এমন একটা ঘটনা ঘটলো যাতে সবটা আমার কাছে জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।"

-"কী ঘটলো?"

-"বলছি শোনো..."- তারানাথ ফের বলতে শুরু করল।

-সেদিন সকাল থেকেই একটা চরম অস্বস্তি মনের মধ্যে টের পাচ্ছিলাম। আগেও বলেছি কিছু ভয়ঙ্কর ঘটবার আগে আমি তার পূর্বাভাস পাই। তাছাড়াও সেই দিন সকাল থেকে খেয়াল করলাম

একটা কাক শ্রীপতি বাবুদের দক্ষিণ পূর্ব দিকের একটা আমগাছে বসে ক্রমাগত ডেকেই চলেছে। ওই দেখো কিশোরী আমার কথা শুনে হাসছে। আমি জানি এসব তোমাদের কাছে হাসির কথার মতোই শোনাবে কিন্তু একবার যে মানুষের সুলক্ষণ কুলক্ষণ চেনায় হাতে খড়ি হয়েছে তার কাছে এসব লক্ষণ কিন্তু মোটেই হাসি মশকরা জিনিস নয়।

যাই হোক মোটকথা সেইদিন কিছু একটা ঘটবে তা বুঝতে পারছিলাম। গ্রামের সবাইকে বলে দিলাম সেই দিনটা অন্তত তারা যেন রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে না বেরোয়। মহাবন্ধন যজ্ঞের অবশিষ্ট ছাই ও অল্প অল্প দিয়ে দিলাম প্রত্যেককে নিজেদের বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এরপর শ্রীপতিবাবুদের বাড়ীর গৃহ বন্ধন করে আমি ঘুমাতে গেলাম। ঘুমানোর আগে সেদিন হঠাৎ করেই কেন জানি না মনে হলো দেহবন্ধনটা করে নেওয়া প্রয়োজন। কে জানে কখন কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়! অতঃপর দেহবন্ধন করে তারপরে ঘুমালাম। সেই ঘটনার এত বছর পর আজ মনে হয় ভাগ্যিস সেই রাত্তিরে ঘুমোবার আগে দেহবন্ধনটা করেছিলাম নইলে যে কি হত!

যাইহোক সেই দিন রাত্রে প্রায় ঘুম হলো না বললেই চলে। বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। মনের মধ্যে সেই দমবন্ধ

ব্যাপারটা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সময় এরকম এপাশ-ওপাশ করতে করতে হঠাৎ কিভাবে চোখ লেগে গেল বুঝিনি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কিছু মানুষের কথাবার্তার আওয়াজে। অত রাতে কারা কথাবার্তা বলছে?

বিছানা ছেড়ে উঠোনে আসতেই দেখি সেখানে শ্রীপতি বাবু, তার স্ত্রী ও পুত্র বধু দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম-" কি হয়েছে শ্রীপতি বাবু? এত রাতে আপনারা সব এখানে?"

শ্রীপতি বাবুর পুত্রবধূ অর্থ ভূপতিচরণের স্ত্রী উত্তর দিলো-' আর বলবেন না ঠাকুরমশাই। পাশের গাঁ থেকে খবর এসেছে আমার বাবামশাইয়ের খুব অসুখ! হঠাৎ করেই নাকি আজ সন্ধ্যেবেলা থেকে বুকের মধ্যে ব্যথা অনুভব করছিলেন। রাতে হঠাৎ বাড়াবাড়ি হয়। শেষ বারের মত মেয়ে জামাইকে দেখতে চাইছিলেন। এখন এত রাতে আমি কি করে যাই বলুন তো! কিন্তু উনি খবর পাওয়া মাত্র যে খবর দিতে এসেছিল তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। এইতো একটু আগেই।"

আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগল। জিজ্ঞেস করলাম-" তোমার বাবা মশাইয়ের খবরটা যে দিতে এসেছিল সে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল?"

-"কই না তো ঠাকুর মশাই! যে ছেলেটি এসেছিল তার নাম মাধব;

আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকে। ও বলল ও নাকি বড্ড তাড়া নিয়ে এসেছে। আমাদের খবরটা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে যাবে। সেই জন্যই তো বাড়ির মধ্যে ঢুকলো না। যতক্ষণ উনি তৈরি হচ্ছিলেন ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বার্তা বলছিল।"

-"এই ভয়টাই আমি পাচ্ছিলাম।"- আর একটাও কথা না বলে সেই মুহূর্তেই আমি শ্রীপতিবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। মনের মধ্যে সেই দমবন্ধ ব্যাপারটা ততক্ষনে চরমসীমায় পৌঁছেছে। আমি বুঝতে পারছি যেটা আটকাতে চেয়েছিলাম সেটা হয়তো আর আটকাতে পারলাম না।

এরপর প্রায় মিনিট কুড়ি গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মতো খোঁজার পর গ্রামের একেবারে প্রান্তের দিকে বিরাট মাঠটায় আমি প্রথম ভূপতিকে দেখতে পেলাম। তার সামনে পিছনে কেউ নেই। সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। তাকে দু তিনবার পিছন থেকে ডেকে বুঝলাম সে আর তার নিজের মধ্যে নেই। কোন কিছুর ঘোর তাকে গ্রাস করেছে। প্রায় পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমি তাকে পিছন দিক থেকে জাপ্টে ধরে ফেললাম। তারপর আমার ডান হাতটা তার মাথায় চেপে ধরে মনে মনে বলতে লাগলাম গুরুর দেওয়া বীজ মন্ত্র। তিনবার বীজ মন্ত্র জপ করার পর দেখলাম ভূপতির

জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে অবাক হয়ে বলল-" ঠাকুর মশাই আপনি এখানে? আমিই বা মাঠের মধ্যে কেন? আমার তো পাশের গায়ে শ্বশুরালয় যাওয়ার কথা..."

-"সেসব পরে হবে ভূপতি! কোথাও তোমার যাওয়ার আপাতত প্রয়োজন নেই। এক্ষুনি বাড়ী চলো।"

কিন্তু ততক্ষনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ করে অনুভব করলাম ভূপতিচরণ আমার পিছনে কিছু একটা দেখে আতঙ্কে ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। আমি অবাক হয়ে পিছনে তাকাতেই যা দেখলাম তা দেখলে যেকোনো মানুষের বুকের ভিতরটাই আতঙ্কে ঠান্ডা হয়ে যেত। আমি দেখলাম আমার থেকে প্রায় দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক নারীমূর্তি। তার শরীরে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। চোখের মনিতেও আগুনের লেলিহান শিখা। ইতিমধ্যে বুঝতে পারলাম হঠাৎ করে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে, মাথার ওপর মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। এরপর ঠিক কি ঘটতে চলেছে তা বোঝার আগেই সেই জলন্ত অগ্নি কন্যা আমার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশ থেকে একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ প্রায় আলোর বেগে আমার দিকে নেমে আসতে দেখলাম!

এরপর তারানাথ হঠাৎ চুপ করে গেল। মিনিট পাঁচ এভাবে চুপ করে

থাকার পর কিশোরী অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল-"তারপর? তারপর কী হল?"

-সেই প্রচন্ড বিদ্যুতের শিখা আকাশ ভেদ করে আমার দিকে সোজা নেমে আসতে থাকলো। তারপর ঠিক আমার মাথার ওপর পাঁচ হাত দূরে হঠাৎ অদৃশ্য কিছুতে একটা ধাক্কা খেয়ে যেন ছিটকে গেল...আর তারপর আমারই চোখের সামনে সেই বিদ্যুৎ শিখা সোজা গিয়ে প্রবেশ করল ভূপতির শরীরে। তার সারা শরীরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রচন্ড বজ্রপাতের শব্দে কানে প্রায় তালা লেগে গেলো । আমি দেখলাম আমার চোখের সামনে ভূপতি অসহ্য যন্ত্রণায় পাগলের মত চিৎকার করতে করতে তার জ্বলন্ত শরীর নিয়ে মাঠের মধ্যে দৌড়াচ্ছে আর অন্যদিকে ঠিক তখনই সেই বীভৎস নারীমূর্তির হাড় হিম করা হাসিতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে সেই রাত্রির সমস্ত নীরবতা। ঠিক সেইদিন,সেই মুহূর্তে ওই মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আমার কি হলো জানি না... হঠাৎ করেই আমার চোখের সামনে প্রায় সিনেমার দৃশ্যের মতো ভেসে উঠলো বহুদিন আগে পড়া একটা পুরনো পুঁথির পাতা! পুঁথিটির নাম "হংসপারমেশ্বর"। আর সেই পুঁথির পাতার ওপরে মার্জিত হস্তাক্ষরে দেবনাগরী হরফে লেখা একটি শব্দও স্পষ্ট পড়তে পারলাম- "বজ্রডাকিনী সাধনম"!

আবার তারানাথ (দ্বিতীয় পর্ব)

//৬//

-বজ্র ডাকিনীর ব্যাপারটা এইবার তোমাদের বলা প্রয়োজন। তোমরা জানো নিশ্চয়ই আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছিলেন বিশাল বড় তান্ত্রিক। তন্ত্র সাধনা নিয়ে তার নিজের লেখা অনেক পুঁথি যেমন ছিল তেমনই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা পুঁথির সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। এই রকমই একখানা পুঁথি ছিল 'হংসপারমেশ্বর'। সেই পুঁথিটি আমি কৌতুহলবশত প্রথম পড়েছিলাম কৈশোরেই লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু তখন কিছু বুঝিনি। পরে সাধনার পর আবার যখন বইটা পড়েছি বুঝেছি ওটা আসলে একটা রত্ন ভান্ডার।

যাইহোক তো 'হংসপারমেশ্বর'-এ বজ্র ডাকিনী জাগরন ও সাধনার বিস্তৃত পদ্ধতি বর্ণিত ছিল। সেই দিন সেই রাতে ওই অবস্থায় কিভাবে যেন আমার অবচেতন মন আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যার সামনে আমি সে রাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম সে আর কেউ নয় সাক্ষাৎ বজ্র ডাকিনী।

সেই ঘটনার পরের দিন সকালেই আমি তড়িঘড়ি নলহাটি থেকে

আমার গ্রামে ফিরে গেলাম। সেখানেই পুঁথিটা ছিল। সেটা ভালো করে পড়ে বুঝলাম আমার ধারণায় কোনো খাত নেই যা বুঝেছি ঠিক তাই। নলহাটিতে কেউ বজ্র ডাকিনীর সাধনা কেউ করেছে।

-"আচ্ছা এই যে বজ্র ডাকিনীর কথা বলছেন এরা কি প্রেতাত্মা গোছের কিছু?"

-"উহু, এরা হলো মনুষ্য সমাজের পরপারে বসবাসকারী অশুভ শক্তি। মূলত সুক্ষ শরীরেই এরা বসবাস করে। এদের ক্ষমতা কিন্তু সাধারণ মানুষের থেকে অনেকগুন বেশি। সাধারণ মানুষের পক্ষে এদের নাগাল পাওয়াও কঠিন। কিন্তু সিদ্ধ সাধকেরা অনেক ক্ষেত্রেই তান্ত্রিক সাধনার মাধ্যমে এদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। অনেক ক্ষেত্রে এদের কোন শবদেহে স্থাপিত করে নিজের বশবর্তী করে কাজে লাগায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শবদেহের প্রয়োজন হয় না এরা আপনিই সূক্ষ্ম শরীরেই বশ মানে। যাই হোক এত সব তত্ত্ব কথা তোমাদের বলে লাভ নেই। তোমরা কিছু বুঝবেও না উল্টে এসব নিয়ে হাসি মশকরা করবে। মানুষের তো নিয়মই ঐ।

যাইহোক হংসপারমেশ্বর পড়ে আমি যা বুঝলাম তার থেকে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল। এক যে সাধক এই বজ্র ডাকিনীকে জাগিয়ে তুলেছে তিনি একইসঙ্গে উচ্চ স্তরের সাধনা ও মহাডামরতন্ত্রে

সিদ্ধ হস্ত। এই দুইয়ের জ্ঞান না থাকলে এই সাধনা করা অসম্ভব কাজ। দুই অবশ্যই যিনি এই কাজ করেছেন তিনি তা নলহাটির সর্বনাশের জন্যই করেছেন,নইলে সমস্ত মৃত্যু কেবল নলহাটিতেই ঘটবে কেন! এখন নলহাটির সর্বনাশ কে চায় সেটা জানতে হবে। তিন,বজ্র ডাকিনীকে একমাত্র তার শরীরেই জাগিয়ে তোলা সম্ভব যে বজ্রাঘাতে মারা গেছে তাও আবার মারা যাওয়ার ষষ্ঠ প্রহরের মধ্যে। সুতরাং হিসেব মতো নলহাটিতে দিন পনেরো আগে বজ্রাঘাতে কে মারা গেছে সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। এবং সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বজ্র ডাকিনীকে শেষ করার কোনো উপায় হংসপরমেশ্বরে লেখা নেই। সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে কোনো সাধারন যজ্ঞ, বন্ধন ইত্যাদির দ্বারা বজ্র ডাকিনীকে আটকানো সম্ভব নয়। শুধু তাই নয় যে সাধক তাকে জাগিয়ে তুলেছে তার ক্ষমতাও আমার থেকে অনেকগুন বেশি সুতরাং শক্তিতে তার সঙ্গে পেরে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাহলে? তাহলে এমন কিছু ভাবতে হবে যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।

-"বাপরে! পুরো জমে গেছে!"- আমি বললাম।

-উহু, তোমরা এখন গল্পের মত শুনছো বলে বলছো জমে গেছে। কিন্তু সেদিন যদি আমার জায়গায় থাকতে তাহলে বুঝতে চোখের সামনে একটা মানুষকে মরে যেতে দেখলে কেমন লাগে। ওঃ কি ভয়ংকরই না

ছিল সেই রাত!

তো হংসপারমেশ্বর পড়ে আমি তো আবার সেদিন বিকেল নাগাদ ফিরে গেলাম নলহাটিতে। ওখানে ততক্ষনে ভূপতির দেহ দাহ করা হয়ে গেছে,কাল রাতে বাজ পড়ার শব্দ পেয়েই ওরা মাঠের দিকে ছুটে এসেছিল। ততক্ষনে অবশ্য বজ্র ডাকিনীর অন্তর্ধান ঘটেছে। আর ভূপতি! তার নিথর জ্বলে পুড়ে যাওয়া শরীরটাও ততক্ষনে লুটিয়ে পড়েছে নরম ঘাসের উপর।

আজ যখন বাড়িতে প্রবেশ করলাম তখন সারা বাড়িতে একটা শোকের ছায়া বিরাজমান। আমি বাড়িতে সবে ঢুকেছি এমন সময় ভূপতির স্ত্রীছুটতে ছুটতে এসে আমার পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো

-" আমার ভুল... আমারই ভুলের জন্য ওকে প্রাণটা দিতে হলো ঠাকুরমশাই....আমারই ভুলের জন্য! বাবা মশাই একদম ঠিক আছেন,তার কিচ্ছু হয়নি। আজ সকালেই লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছি। আমিই কাল রাত্রে জোর করে ওনাকে পাঠালাম, আপনার কথা না শোনার ফল এখন ভুগতে হচ্ছে..."

-"ওঠো। ওঠো মা। কী আর করা যাবে বলো! যার যাবার ছিল তাকে কি তুমি আটকাতে পারবে? তবে চিন্তা করো না আমি কথা দিলাম

আর একটিও প্রাণকে আমি বিনা দোষে মরতে দেব না।"

-"আগেও তো ঐ একই কথা বলেছিলেন। কিছুই তো করতে পারলেন না। যত্তসব ভোজবাজি; ঠগ, জোচ্চরের কারবার।"- কথাটা বলল এক বছর একুশের যুবক। দীর্ঘ দেহ, পেশীবহুল শরীর, চোখেমুখে অহংকারের ছাপ।

-"আঃ নৃপতি! কোথায় কী বলতে হয় জানো না তুমি? জানো উনি কে?"- ভূপতি বাবু কড়া গলায় বললেন।

-"হবে কোনো তান্ত্রিক, ওঝা,রোজা! তোমার আর কাজ কি! যত সব ভন্ডগুলোকে ধরে আনো আর বাড়িতে পোষো। কাজের কাজ তো কিছুই হয় না... যত্তসব!"

-"আমি তোমাকে বলছি নৃপতি, তুমি এই মুহূর্তে উপরে যাও। আর একটা কথাও যদি তুমি এখানে বল আমি ভুলে যাব তুমি আমার ছেলে।"

বাবার কথায় নৃপতি নাক ফোলাল। একবার রোষকটাক্ষে আমার দিকে তাকাল। তারপর পিছন ফিরে গটগট করে এগিয়ে যেতে থাকলে দোতলার দিকে। দু তলার সিঁড়ি দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যেতেই শ্রীপতি বাবু হাতজোড় করে বললেন

-" ওর হয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ঠাকুর মশাই! ওকে আপনি চেনেন না। ও নৃপতি, আমার ছোট ছেলে, এই কদিন কলকাতায় ছিল। দাদার মৃত্যুর খবর পেয়ে ফিরে এসেছে। কি বলবো ঠাকুরমশাই, নৃপতি ওর দাদার একেবারে বিপরীত। ধর্মে মতি নেই, চরম নাস্তিক। ওর সঙ্গে কথা বলে কেউ কখনো শান্তি পায়নি।"

-"পাবে... পাবে... ওর সঙ্গে কথা বলে অনেকেই শান্তি পাবে।"

আমার কথা শুনে শ্রীপতিবাবুর ভ্রু কুচকালো। তিনি বললেন-" মানে?"

-"এই শোকের সময় আমার হয়তো এ কথা বলা উচিত নয় কিন্তু সত্যি তো বেশিদিন চাপা থাকে না।একদিন তো সে প্রকাশ পাবেই। তাই বলছি শুনে রাখুন আপনার এই ছেলেকে আপনি বেশি দিন ঘরে বেঁধে রাখতে পারবেন না। ওর মধ্যে সাধক হওয়ার সব লক্ষণ স্পষ্ট ও ভবিষ্যতে খুব বড় সাধক হবে। মানুষের হিত করবে। আর একটা ধাক্কার জন্য তৈরি থাকুন। খুব শিগগিরই আপনার এই ছেলে ঘর ছাড়বে।"

আমার কথা শুনে শ্রীপতিবাবুসহ সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকে পাথরের মত স্থির হয়ে গেলেন। তাদের সকলের দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমার এক মুহূর্তের জন্য যেন সেদিন মনে হয়েছিল- কথাটা হয়তো সেই

সময় দাঁড়িয়ে না বললেও হতো। যা ঘটার তা তো এমনিতেই ঘটবে। মানুষ তা আগে থাকতে জানলেই বা কি না জানলেই কি!

//৭//

এর পরের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বলি। ভূপতির দেহ যেদিন দাহ করা হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই শ্রীপতি বাবুর বাড়িতে সমস্ত গ্রামবাসীকে নিয়ে আরেকটা আলোচনা সভা বসল বলা ভালো আমার কথায় বসানো হলো। সেখানে আমি নিজের চোখে আগের রাতে যা যা দেখেছি সবটা বললাম। সে সব শুনে অনেকে শিহরিত হলো, কেউ কেউ পাশের জনকে জাপটে ধরল, কারুর কারুর আবার আতঙ্কে মুখ পাংশুটে হয়ে গেল।

-"এর হাত থেকে মুক্তির কি কোন উপায় নেই ঠাকুরমশাই?"- গ্রামের একজন জিজ্ঞেস করল।

-'আছে... নিশ্চয়ই আছে!"-একরকমের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আমি বললাম-" তবে তার আগে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন।"

-"কি প্রশ্ন?"

-"দিন পনেরো আগে মানে এই মৃত্যুগুলো শুরু হওয়ার আগে এ গাঁয়ে কি কেউ বাজ পড়ে মারা গিয়েছিল?"

আমার প্রশ্নে ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। এর কিছুক্ষণ পরে একজন বলে উঠল-" হ্যাঁ গেছিল তো... আগের মাসে আমাদের গাঁয়ের পুরুত মশাই এর মেয়ে ফুলি তো মারা গেছিলো মাথায় বাজ পড়েই। ওকে দাহ করতে তো আমরাই গিয়েছিলাম শ্মশানে। কিন্তু সেখানে এমন একটা কান্ড হলো..."

-"কী কান্ড?"

-"আর বলবেননা ঠাকুরমশাই। ফুলির চিতায় আগুন দিতে যাব এমন সময় কোথা থেকে প্রচন্ড ঝড় উঠলো। অথচ তার পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত কোথাও ঝড়ের লক্ষনটুকু ছিল না। সেই প্রচণ্ড ঝড়ে আমরা তো সবাই চিতা ছেড়ে কিছুটা দূরে ছাউনি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বাইরে কেউ রইল না। তারপর মিনিট পনেরো পরে যখন ঝড় থামল, তখন বাইরে বেরিয়ে দেখি চিতায় নিজের থেকেই আগুন জ্বলছে! কে কিভাবে চিতায় আগুন দিল বুঝতেই পারলাম না!"

-"বুঝলাম..."-মনে মনে নিজেকে বললাম-"তারমানে যার শরীরে বজ্র ডাকিনীকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে সে এ গাঁয়েরই মেয়ে!" তারপর

সবার উদ্দেশ্যে আবার জিজ্ঞাসা করলাম

-"আচ্ছা তোমাদের কি মনে হয় এই গ্রামের সর্বনাশ চায় এমন কেউ আছে?"

আমার এ কথায় আবার ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কিন্তু এইবার ঠিকঠাক কোন উত্তর মিলল না। এক একজন এক একটা নাম বলতে লাগলো... অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সব নাম ব্যক্তিগত শত্রুতারই ফলাফল। সেসব কোনো নামই কাজের বলে আমার মনে হলো না। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ একটা বাচ্চা মেয়ে, বয়স বছর দশ হবে; এগিয়ে এসে বলল -" আমি জানি ঠাকুর মশাই কে এই গাঁয়ের ক্ষতি চায়।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম-"কে সে?"

-"চাঁদু কাকা। ও আবার ফিরে এসেছে... ওকে আমি নিজে দেখেছি।"

-"এই চাঁদু কাকা কে?"- আমি জিজ্ঞেস করলাম।

অন্য কেউ একজন উত্তরটা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ওই বাচ্চা মেয়েটিই বলতে লাগলো

-" চাঁদুকাকার ভালো নাম চন্দন। ও এই গ্রামেই থাকত অনেকদিন আগে। চাঁদু কাকার বউ রাঙা কাকিমা খুব ভালো ছিল। আমি তাকে খুব ভালবাসতাম। ওদের বাড়িতেই তো সব সময় থাকতাম। চাঁদু কাকার বউ আমায় কুল, পেয়ারা, নাড়ু কত কিছু খেতে দিত। এটা আজ থেকে প্রায় অনেক দিন আগের ঘটনা...কিন্তু তবুও আমার স্পষ্ট মনে আছে সব... সেই দিন রাঙা কাকিমা কোথায় একটা গেল আমায় কুল খেতে দিয়ে। আমি একমনে কুল খাচ্ছি হঠাৎ চাঁদুকাকা ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর আমার পাশে বসে হঠাৎ আমার বুকে, পেটে, পায়ে হাত বোলাতে শুরু করলো। আমি অনেক বারণ করলাম। চাঁদু কাকা বললো-" রাগ করে না খুকি। আমি তোমায় আদর করছি তো!" এমনভাবে অনেকক্ষন আদর করার পর আমার পেটের মধ্যে হঠাৎ খুব যন্ত্রণা হলো... আমি চিৎকার করতে থাকলাম...আমার শরীর থেকে রক্ত বেরোচ্ছিলো... কোথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিলো জানো? যেইখান দিয়ে আমি..."

-"থামো... থামো। আর বলতে হবে না মা। এসো, আমার কাছে এসো।" মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়ে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। একজন পুরুষ হয়ে ওই দশ বছরের নিষ্পাপ মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে সেদিন আমার লজ্জা করছিল।

এরপর গাঁয়েরই একজন বলল-"ওর নাম টুসু,এ গাঁয়ে থাকে। বাপ মা মরা মেয়ে, মামা মামীর কাছে মানুষ। ভালোবাসার কাঙাল। চাঁদুদের বাড়িতে যেত চাঁদুর বউটার কাছে। চাঁদুর বৌ টুসুকে খুব ভালবাসত। ও যে দিনের কথা বলছে বছর পাঁচ আগে সেই দিন আমরা ওকে চন্দনের বাড়ি থেকে উদ্ধার করি। মাত্র পাঁচ বছর বয়সের মেয়েটার সেই দিন জামা-কাপড় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছিল। শরীর ছিল রক্তাক্ত। ওই শয়তানটা এই ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে আরো যে কী কী করেছিল তা এতোলোকের সামনে বলতে আমার মুখে বাধে ঠাকুরমশাই। এই মেয়েটা নিষ্পাপ,ওর মন সরল। তাই এমনভাবে সবটা বলতে পারল। সেদিন গাঁয়ের সকলের কাছে বেধড়ক মার খেয়েছিল চাঁদু,প্রায় মরতে মরতে বেঁচে ছিল যাকে বলে। ওই ঘটনার পরের দিন রাত থেকেই আর ওকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ও নিখোঁজ... আমরা তো ভাবতাম ও বোধহয় লজ্জায় আত্মহত্যা করে মরেছে।"

-"না! চাঁদু কাকা বেঁচে আছে। ওই চোখ আমি দেখেছি... আমি প্রথমবার দেখেই চিনতে পেরেছি। শুধু অনেক বড় বড় চুল আর দাড়ি হয়েছে চাঁদুকাকার। ঠিক সন্ন্যাসীদের মতো। আমাদের গায়ের পাশে যে জঙ্গলটা তার একধারে আমি দুদিন ওকে দেখেছি। কি সব করছিল যেন..."

-"সেই জায়গাটায় আমাদের তুমি নিয়ে যেতে পারবে টুসু?"

-"কেন পারব না? চলো আমার সাথে। এক্ষুনি নিয়ে যাব। কোনো অসুবিধা নেই।"

//৮//

টুসুর সঙ্গে জঙ্গলের এক প্রান্তে সেই স্থানটিতে গিয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। যে সাধক সেখানে আস্তানা গেড়েছিল সে বোধহয় লোকজনের আওয়াজ পেয়ে বর্তমানে গা ঢাকা দিয়েছে কিন্তু তার সাধনের স্থানটিতে বজ্র ডাকিনী সাধনার সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এবং মনে মনে যেন আরো অসহায় বোধ করলাম এর বিহিত করবো কীভাবে সে কথা ভেবে।

এর পরের দিন আর একটা মহাবন্ধন যজ্ঞ করলাম। আগের মতোই তার ছাই ছড়িয়ে দিলাম গ্রামের এক প্রান্তে সাময়িক প্রতিবিধান হিসেবে। কিন্তু মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটলো না বুঝলে তো! কারণ আমি তো জানি এসব করে কিচ্ছু হবে না। এমন একটা পথ খুঁজে বার করতে হবে যাতে এই সমস্যার মূল একেবারে গোড়া থেকে উৎপাটিত করা যায়। এরপর আমি আবার আমার গ্রামে ফিরে গেলাম। সেখানে

তন্ন তন্ন করে সমস্ত পুঁথি, তন্ত্র সম্বন্ধিত যাবতীয় সব রকমের বই ঘাটলাম। কিন্তু কোথাও কিছু পেলাম না। এত খোঁজার পরেও কিছু না পেয়ে আমি তো প্রায় এক রকমের সমস্ত আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম কিন্তু তখনই ঘটলো সেই অদ্ভুত ঘটনা যা আমাকে আবার আশার আলো দেখালো।

-"কী ঘটনা?- কিশোরী জিজ্ঞেস করে।

-"বলব তবে তার আগে একটা সিগারেট খাব। অনেকক্ষণ ধরে গল্প বলছি। আর একটা সিগারেট না হলে ঠিক জমছে না।"

এই বলে তারানাথ আর একটা সিগারেট ধরালো। তারপর তাতে মৌজ করে টান দিতে দিতে আবার বলতে শুরু করল-

-তোমাদের বোধহয় বলতে ভুলে গেছি যে এই বজ্র ডাকিনী সাধনার একটা বিশেষ নিয়ম আছে। বজ্র ডাকিনীকে জাগিয়ে তোলার দুই পক্ষের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ বশ করা যায় না। তবে এই সময়কালে সে সাধকের কিছু আদেশ পালন করে। এই বজ্র ডাকিনী কিন্তু সাংঘাতিক। এদের অঙ্গুলীহেলনে বজ্রপাত হয়। নলহাটির এই বজ্র ডাকিনীকে জাগিয়ে তুলেছিলো যেই সাধক সে যে খুব শিগগিরই একে বশ করে ফেলবে সেই দুশ্চিন্তাই আমাকে আরও অস্থির করে তুলছিল। আর

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই সাংঘাতিক ডাকিনী যদি কারোর বশ হয় তাহলে তাকে দিয়ে কী কী করানো যেতে পারে!

যে অদ্ভুত ঘটনাটার কথা বলছি সেইটা এইবার বলি। সেই দিনই গ্রাম থেকে পুঁথিটি দেখে আবার ফিরে গেছিলাম নলহাটিতে। সেখানেই সেদিন রাত্রিবেলা ঘটল সেই ঘটনা। ওই ঘটনা আদেও সত্যি ছিল না কি স্বপ্ন তা আজও আমি বুঝতে পারিনি। তবে তা যে আমার এই কঠিন সমস্যার সমাধানের পথ দেখিয়েছিল তা স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।

সেদিন রাত্রিবেলা তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মাঝ রাতে কিভাবে যেন ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই দেখলাম এক শ্মশানে আমি বসে আছি। আমার সামনে একটি শবদেহের উপর চোখ বুজে বসে আছে এক নারীমূর্তি। তার চুল খোলা, মুখে অসামান্য তেজস্বিতার ছাপ, পরনের শাড়ি আলুথালু। তাকে দেখেই এক মুহূর্তে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো- "মাতু পাগলি!"

আজ্ঞে হ্যাঁ! এই মাতু পাগলীর কথা তো তোমাদের আগেও বলেছি। মহাডামরতন্ত্রে প্রসিদ্ধ এই নারীর সঙ্গে আমার সাধন জীবনের একদম প্রথমদিকে পরিচয় হয়। তার কাছে ছিলাম কিছু মাস। সে তার কিছু শক্তিও আমায় দান করেছিল।

মাতু পাগলি চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল। তারপর পাগলের মত খল খল করে হেসে উঠে বললো-" এখনো বুঝলি না তারানাথ! এখনো বুঝলি না? বজ্র ডাকিনীকে আটকানো যাবে কিসে এখনো বুঝলি না?"

-"না বুঝি নি। তুমিই বলো।"- আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললাম।

-"এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শক্তি কি তারানাথ?"

-"সবচেয়ে বড় শক্তি! কি সেটা?"- আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। সবকিছু বুঝতে পারছিলাম আবার কিছুই যেন বুঝতে পারছিলাম না।

এবার দেখলাম মাতু পাগলি ওর সাধনার শবদেহটার ওপর থেকে নেমে এলো। তারপর আমার কাছে এসে আমার বুকে তার হাত রেখে বলল-" এবার বল তারানাথ এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শক্তি কী?"

তার হাতের স্পর্শে আমার সারা শরীরে যেন একটা শিহরণ জেগে উঠলো। আমি বলে উঠলাম-" ভালোবাসা... নিঃস্বার্থ ভালোবাসা... সেইটাই তো এই পৃথিবীতে সবচাইতে বড় শক্তি!"- কিভাবে কোথা থেকে যে উত্তরটা বেরিয়ে এলো আমি বুঝতেই পারলাম না। আমার কথা শুনে মাতু পাগলি পাগলের মত হাসতে শুরু করল। তারপর হাসতে হাসতেই বললো-" যাঃ! এবারের মতো তোর কাজ হয়ে যাবে।

নে এবার পালা, পালা, পালা এখান থেকে বলছি। অনামুখো কোথাকার!"

এর কিছুক্ষণ পরেই আমি আবিষ্কার করলাম আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। সমস্ত ঘর অন্ধকার, শুধু একটি প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে। আমি উঠে বসলাম। সেই রাতে আর ঘুম এলো না। পরেরদিন ভোরের আলো ফুটতেই আমি কোনোমতে জামা গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গায়ের পুরুত মশাইয়ের বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। পুরুতমশাইয়ের সঙ্গে তার মেয়ে ফুলির ব্যাপারে অনেক কথা হল। ভদ্রলোক স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েছিলেন। তাকে কিছু সান্তনা দিলাম। তারপর একসময় জিজ্ঞেস করলাম-" ঠাকুর মশাই একটা প্রশ্ন করবো। এই গাঁয়ের সব মানুষের বাঁচার জন্য এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া খুব জরুরী। আপনি উত্তর দেবেন বলুন।"

-"কী প্রশ্ন বাবা? জানলে নিশ্চয়ই বলবো।"

-"আপনার ফুলি যে ছেলেটিকে ভালবাসত তার নাম কী ঠাকুর মশাই?"

এই প্রশ্নে পুরুত মশাই কিছুক্ষণ পাথরের মত আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মাথা নিচু করে চোখের জল মুছতে মুছতেই

ছেলেটার নাম বললেন। নামটা শোনামাত্রই আমি চমকে উঠলাম। তারপর কিছুক্ষন নিস্তব্ধ হয়ে বসে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেরই মনে মনে বললাম-" হায়! নিয়তির লিখন কি এতো সহজে খন্ডানো যায়!"

//৯//

একটি প্রায় অন্ধকার ঘর। সেখানে টিমটিম করে একটি প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপের স্বল্প আলোয় চারপাশের অন্ধকার যেন আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে ভালো করে তাকালে দুজন মানুষের অবয়ব ঠাওর করা যায়। তাদের মধ্যে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ, অন্যজন যুবতী রমনী। রমণীটি শাড়ির আঁচলের খুট দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে কাঁদছে। তার সামনে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক পুরুষটি তার দিকে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে। একসময় চোখের জল মুছতে মুছতে রমণীটি বলল-

-"আপনি যা বলছেন সব সত্যি? ও আমায় মেরে ফেলতে চাইবে?"

-"আমি মিথ্যা বলছি কিনা তা পরীক্ষা করার সুযোগ তো তোমার কাছে থাকবে। তখন মিলিয়ে নিও।"

-"কিন্তু আমি যে ওকে এত সাহায্য করলাম... সেই প্রথম দিন যখন ও নলহাটিতে ফিরে এল সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত রোজ আমি গাঁয়ের সবার চোখ এড়িয়ে ওর জন্য রাতে খাবার নিয়ে গেছি। ওর সাধনায় যা যা লাগবে সমস্ত এনে দিয়েছি এক কথায়। এই এত কিছুর পরেও ও এমনটা করবে?"

-"প্রতিহিংসা... প্রতিহিংসা এমনই এক জিনিস যা মানুষের মনে একবার ঢুকলে তাকে সম্পূর্ণ অধঃপতিত না করা অবধি নিস্তার দেয় না। আর তাছাড়াও গ্রামবাসীদের কথাটাও ভাবো। তুমি তো এই গ্রামেরই মেয়ে। এই গ্রামের মানুষ জনের প্রতি তোমার কি কোনো দায়িত্ব নেই? তুমি চাও না এই গ্রামের মানুষগুলো শান্তিতে বেঁচে থাকুক?"

-"কিন্তু আমি যে ওকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে এমনটা করব কেমন করে? আর ও কি আমায় এতটুকুও ভালোবাসে না?"- রমণীয় চোখ ছল ছল করে ওঠে। তার কণ্ঠে ঝরে পড়ে সকরুণ আকুতি।

-"যে মানুষ কামের তাড়নায় একটা নিষ্পাপ বাচ্চাকে পর্যন্ত ছাড়ে না,সে তোমার ভালোবাসার মূল্য দেবে এটা ভাবলে কি করে? নিঃস্বার্থ ভালোবাসা হল অমূল্য রত্নের মত মা। সকলে তার যোগ্য নয়। যে জন

সেই রত্নের মান জানে একমাত্র তাকেই সে রত্ন দেওয়া উচিত। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা ঝোলালে মুক্তো মুক্তোই থাকে বটে কিন্তু মালাটি ছিড়ে যায় এই যা। আর তাছাড়াও তাকে যদি তুমি ভালোবেসেও থাকো তাহলেও এই নিকৃষ্টতম পাপকার্য করার থেকে তাকে বাধা দেওয়াটাও তো তোমারই কর্তব্য। নয় কি?"

রমণী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ক্রমশ মৃদু সম্মতি সূচক মাথা নাড়ায়।

-"তাহলে আশা করছি গ্রামবাসীদের হিতার্থে তোমায় আমি আমার পাশে পাব।"

রমণীটি পুনরায় মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। মধ্যবয়স্ক পুরুষটি বলেন-"তাহলে আজ উঠি। যেমনটা বললাম তেমনটাই করো। এই নলহাটির মানুষ আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

রমণীটি পুনরায় সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায়। মধ্যবয়স্ক পুরুষটি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান। ঘরের প্রদীপের আলো ক্রমশ স্বল্প হতে হতে একসময় দপ করে নিভে যায়। তারপর থেকে যায় শুধু অন্ধকার, নিস্তব্ধতা আর এক রমণীর নিঃশব্দ কান্নার সুর। ভালো করে কান পাতলে বোঝা যায় রমণীটি একটাই কথা প্রায় পাখি পড়ার মতো

বারংবার নিঃশব্দে আউরেই চলেছে। আর সেই কথাটি হলো -" হা ঈশ্বর আমার পেটে যে ওর সন্তান... যে আসছে তাকে শুধু তুমি দেখো, তুমি দেখো!"

//১০//

-"এইবার কিন্তু আমরা প্রায় এই ঘটনার শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি।" সমাপ্ত সিগারেটটা পাশের নারকেলের মালায় গুঁজতে গুঁজতে বলল তারানাথ-" মন দিয়ে শোনো..."

(ক্রমশ)

ইভেন্ট করালকিংবদন্তী ২

আবার_তারানাথ(অন্তিম পর্ব)

//১০//

-"এইবার কিন্তু আমরা প্রায় এই ঘটনার শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি।" সমাপ্ত সিগারেটটা পাশের নারকেলের মালায় গুঁজতে গুঁজতে বলল তারানাথ-" মন দিয়ে শোনো..."

-দেখতে দেখতে আরেকটা অমাবস্যা চলে এলো। সেই অমাবস্যাতেই যে সেই সাধক বজ্র ডাকিনী বশীকরণ যজ্ঞতে বসবে তা আমি বিলক্ষণ জানতাম। কারণ ইতিমধ্যেই সেই সাধক আরও হিংস্র ও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। শেষ কিছুদিনে নলহাটির নিরীহ মানুষদের প্রাণনাশের সকল প্রকার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে সে। ভূপতির পরে নলহাটিতে সেদিন পর্যন্ত আর কেউ মারা যায়নি। এত কিছুর পরেও সেই সাধক যে চুপ করে বসে থাকবে না তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছিলাম। বিশেষ করে যার মনে প্রতিহিংসার আগুন লকলক করছে তার পক্ষে তো এই সুযোগ হাতছাড়া করা অসম্ভব।

আর একটি জিনিসও আমি স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম। বজ্র ডাকিনীকে থামাতে হলে তার সাধকের বিনাশ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ অভিচার অনুসারে সাধকের শরীরে যতক্ষণ রক্ত প্রবাহিত হবে ততক্ষণ বজ্র ডাকিনীর শক্তি অপরাজেয় থাকবে। সুতরাং সেদিন বজ্র ডাকিনীকে বশীকরনের পূর্বেই সেই সাধকের মৃত্যু সমগ্র নলহাটির গ্রামবাসীদের জন্য অপরিহার্য ছিল। কিন্তু সেটা কি অতই সহজ কাজ?

তোমাদের তো আগেই বলেছি যে যেই সাধক বজ্র ডাকিনীকে জাগিয়ে তুলতে পারে সে একই সঙ্গে উচ্চ ও নিম্ন স্তরের সাধনায় সিদ্ধহস্ত। এমনকি ফুলির সরকারের দিনকার ঘটনা শুনে আমার মনে হয়েছিল তার বশীকৃত বেতাল থাকাটাও অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং এহেন সাধককে যে অতি বড় পালোয়ানও হত্যা করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার ছিল না। বরং আমার বিশ্বাস ছিল নিয়তির উপর... নিয়তির যে খেলা নিজের হাতে সাজিয়েছেন তা ভাঙতে পারে এমন ক্ষমতা কার আছে?

তোমাদের বলেছি কি যে বজ্র ডাকিনি জাগরন যে স্থলে করা হয় সেই স্থলে বজ্র ডাকিনী বশীকরণ যজ্ঞ করলে তা অতি দ্রুত সফল হয়! এর সঙ্গে স্থান মাহাত্যের একটা নিবিড় যোগ আছে। সেসব তত্ত্বকথা পরে কখনো শোনাবো না হয়। মোট কথা আমার মন বলছিল সেই সাধক

ওই অমাবস্যার রাতে আবার সেই নদী তটে ফিরে আসবে বশীকরণ যজ্ঞে বসার জন্য। আর সেটাই ছিল আমার কাছে একমাত্র আশার কথা। সুতরাং সেই অমাবস্যার আগের দিন গ্রামের সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম ভুলেও অমাবস্যার দিন কেউ যেন জঙ্গলের দিকে পা না বাড়ায় এবং এই কথাটি যেন সকলেই গোপন রাখে। আসল কথা আমি চাইছিলাম সেই সাধক ওই রাতে ওই নদী তটে আবার আসুক, যজ্ঞে বসুক। তারপর বাকিটা আমি দেখে নেব।

সেই দিন সকালবেলা শ্রীপতিবাবু একটা অদ্ভুত খবর দিল-" কালরাত্রে চন্দনের বউটা বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেছে জানেন ঠাকুর মশাই! আপনার সঙ্গে আলোচনার পর থেকেই চন্দনের বৌয়ের উপর আমরা কড়া নজর রাখছিলাম। কাল সন্ধ্যাবেলায় সে যেমনি কাজে বেরোবার বেরিয়ে ছিল, রাতে ফিরেও এসেছিল। কিন্তু সকাল বেলায় দেখা গেল সে তার ঘরে নেই, এক থালা অন্ন ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে, ঠিক যেন খেতে খেতেই উঠে খাওয়া অসমাপ্ত রেখে সে কোথাও চলে গেছে!"

-"আচ্ছা তাই নাকি!"- সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করে আমি চুপ করে গেলাম। দেখতে দেখতে সকাল কেটে সন্ধ্যা গড়িয়ে যখন রাত্রির অন্ধকার নামবে নামবে করছে সেই সময় আমি শ্রীপতিবাবুদের বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়লাম, অবশ্যই একা একা। জঙ্গলে ঢোকার আগে

পূর্বেকার পরিকল্পনা মত আরো দুজনের সঙ্গে দেখা হলো। তারা ওখানে অপেক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে একজনকে বললাম-"যেমনটা বলেছি তেমনটাই কোরো। আমি যখন শিস দেবো তখনই জঙ্গলে প্রবেশ করবে তার আগে নয়। আর জায়গাটা চেনো তো?"

-" যে আজ্ঞে ঠাকুর মশাই,জায়গাটা চিনি। যেমনটা বুঝিয়েছেন তেমনটাই করবো।"

ব্যাস,আরেক জনকে নিয়ে আমি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তারপর কিছু দূর হেঁটে পৌছালাম সেই নদী তটে যেখানে সেই সাধক বজ্র ডাকিনীকে জাগিয়ে তুলেছিল। তারই এক প্রান্তে একটা ঝোপের আড়ালে প্রায় ঘাপটি মেরে আমরা দুজনে বসে রইলাম। রাত ক্রমশ বাড়তে থাকল। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার আরো গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকলো। একসময় একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দে কেমন যেন একটা ঝিম মতো ধরে এসেছিল, হঠাৎই আমার পাশের জনের সতর্ক কণ্ঠস্বরে আমার হুশ ফিরল-" ওই যে ঠাকুরমশাই! ও এসেছে!"

আমি দেখলাম বিশাল জটাজুটধারী এক সাধক নদী তটে এসে একটা ঝুলি থেকে কি সব জিনিস বার করছে। আমিও ফিসফিস করে বললাম-" এখনই কিছু করা যাবে না, আগে যজ্ঞে বসুক। যজ্ঞে একবার বসলে না শেষ করে ওঠার নিয়ম নেই। এখন আগেভাগে কিছু

করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আর মনে আছে তো আগে আমি যাবো তারপর সময় মত পিছন থেকে তুমি..."

পাশের জন নীরবে সম্মতি জানালো। এরপর আমি দেখতে থাকলাম সেই সাধক একে একে সমস্ত রকম আয়োজন করে তারপর যজ্ঞে বসলো। একসময় তার যজ্ঞের আগুন ঘিয়ে লকলক করে উঠলো। যজ্ঞের সেই লেলিহান আগুনের শিখা জঙ্গলের সেই অন্ধকারকে যেন আরো নারকীয় করে তুললো। এইবার আমি বুঝলাম পাখি ফাঁদে পড়েছে। আর যজ্ঞ ছেড়ে ওঠা সাধকের পক্ষে সম্ভব না। উঠলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আমি উঠে দাঁড়ালাম, ঝোপঝাড় ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম সেই সাধকের সামনে। তারপর প্রচন্ড জোরে একটা শিস দিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বললাম-

-"চন্দন তোমার খেলা শেষ!"

আমার কথা শুনে যজ্ঞকালীন ধ্যানরত সেই সাধক চোখ খুললো। তারপর একটা শ্লেষের হাসি হাসতে হাসতে বললো-" তারানাথ! তারানাথ তান্ত্রিক! শেষমেষ তাহলে তুমি এলে! আমার মনেই হয়েছিল তুমি আজ আসবে... তাই আগে থাকতেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করে রেখেছি। দেখা যাক কার কত ক্ষমতা!"- এই বলে মাথা দোলাতে দোলাতে কি একটা ছাই সে ছুড়ে দিল যজ্ঞের আগুনে। আর সঙ্গে সঙ্গে

আবার লকলক করে উঠলো যজ্ঞের শিখা।

আর প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম একটা অদৃশ্য নাগপাশ ক্রমশ আমাকে আবদ্ধ করছে। আমি নড়তে পারছি না এমনকি হাত পর্যন্ত নাড়াতে পারছি না। এমনিতেই আমার দেহবন্ধন করা ছিল ফলে কোন রকম অশুভ নাগপাশ কার্যকরী হওয়ার কথাই না। কিন্তু সেই সাধকের শক্তি এতটাই যে আমার দেহ বন্ধনও তার নাগপাশের সামনে খড়ের মতো উড়ে গেছে।

-"কি তারানাথ তান্ত্রিক! ভয় পেয়ে গেলে নাকি?" আমার দিকে তাকিয়ে চন্দন একটা বিশ্রী হাসি হেসে উঠলো।

-"ভয় তো তোমার পাওয়ার কথা চন্দন। একের পর এক যে পাপ তুমি করেছ তাতে তোমার বিনাশ কাল উপস্থিত হয়েছে।"

-"এই চুপ! চুপ! আমাকে পাপ পুণ্য শেখাতে আসিস না! যা করেছি বেশ করেছি। একটা বাচ্চা মেয়ের শরীরে হাত দিয়েছি এইতো? বেশ করেছি। কামের কাছে বাচ্চা বুড়ো সব সমান।"

-"ছিঃ তোমার নিজেকে মানুষ বলতেও লজ্জা করে না চন্দন? সাধন পথে গিয়ে কতগুলো শক্তি পেয়েছ, সেগুলো মানুষের হিতার্থে ব্যবহার না করে সেগুলো দিয়ে মানুষের সর্বনাশ করছ? এমনকি যে মেয়েটা

তোমায় পাগলের মতো ভালোবাসে, যার গর্ভে তোমার সন্তান তাকে পর্যন্ত বিষ খাওয়াতে ছাড়োনি?"

-"বেশ করেছি! বিষ খাওয়াবোই তো। একরাত্রি শরীরটা জেগে উঠেছিল, সঙ্গম করেছিলাম। তাই বলে কি বাচ্চা বিয়োতে হবে? হারামজাদি মাগি কোথাকার! সংসার জীবনেও জ্বালিয়েছে! সাধন জীবনেও জ্বালাতে এসেছিল। ওকে দিয়ে প্রথম দিককার কাজ উসুল করাটাই আমার লক্ষ্য ছিল। আর তুমি কি করছো না করছো সেটা জানতেও ওকে আমার দরকার ছিল। বোকা মেয়ে! ভেবেছিল আমি ওকে ভালোবাসি....হা হা হা... যাই হোক ওর প্রয়োজন যখন মিটে গেছে তখন আর ওকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ? এবার তুইও বরং তোর সময় গুনতে শুরু কর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের প্রথম বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার বশীভূত হয়ে যাবে বজ্র ডাকিনী। আর জানিস তো একবার বশীভূত হলে তার শক্তিও কত গুণে বৃদ্ধি পাবে? তখন আর কোনো শক্তি তাকে ঠেকাতে পারবে না। তোর দেহ বন্ধন তো তার কাছে নস্যি... হা...হা...হা...আজকে তার প্রথম শিকার হবি তুই। তারপর নলহাটির সমস্ত ছেলে বউদের পালা। এক রাতের মধ্যে এই গা উজাড় হয়ে যাবে... চন্দনের গায়ে হাত তোলার ফল এখানকার লোক হাড়ে হাড়ে টের পাবে!"

-"দাঁড়াও চন্দন। এখনই এতটা তাড়াহুড়ো কোরো না। খেলা এখনো শেষ হয়নি। পিছনে ঘুরে দেখো মৃত্যু আসলে কার জন্য অপেক্ষা করছে!"

আমার কথা শুনে চন্দন খানিকটা অবাক হয়ে পিছনে ফিরে তাকাতেই প্রায় ভুত দেখার মত চমকে উঠলো। সে দেখল তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর নারী মূর্তি। তার পরনে আলুথালু শাড়ি, হাওয়ায় উড়ছে খোলা চুল, চোখে দাউদাউ করে জ্বলছে ক্রোধের আগুন আর হাতে চকচক করছে শাণিত খড়্গ!

-"রাধারানী তুই! তুইতো ওই বিষ মেশানো অন্ন খেয়ে..."- চন্দন এর কণ্ঠে প্রচন্ড আতঙ্কের ছাপ।

-"হ্যাঁ আমি রাধারানী! কি ভেবেছিলিস তুই তোর দেওয়া বিষাক্ত অন্ন খেয়ে আমি মরে গেছি তাইনা? আমার শরীর রাতের অন্ধকারে শেয়াল-কুকুরে ছিড়ে খেয়েছে তাইনা? আসলে তোর সমস্ত পরিকল্পনা আমি আগেই জেনে গিয়েছিলাম ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে। তাও তোকে পরীক্ষা করছিলাম শেষবারের মতো। কিন্তু কালকে তোর দেওয়া অন্ন খেয়ে পাড়ার বিড়ালটা যখন মরে গেল তখন আর কোন সন্দেহ রইল না। ওই বিড়ালটাকে পিছনের বাগানে পুঁতে দিয়ে আমি গা ঢাকা দিলাম ঠাকুরমশাইয়ের কথা মত আমাদের গাঁয়ের পুরুতমশাইয়ের

বাড়িতে। যাতে তুই ভাবিস আমি মরে গেছি আর আবার ফিরে আসিস এখানে... মরবার জন্য!"

রাধারানীর কথা শুনতে শুনতে প্রায় পাগলের মত কি একটা ছাই বারবার যজ্ঞের আগুনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল চন্দন।

-"ওতে কিছু লাভ হবে না চন্দন,সেটা তুমিও ভালো করে জানো। তোমার কোন শক্তি আজ রাধারানীকে আটকাতে পারবেনা। এই হল নিয়তির লিখন... তোমার মৃত্যু আজ ওর হাতেই লেখা আছে। তুমিও ভালো করেই জানো পৃথিবীর কোনো শক্তি এ লেখা খন্ডাতে পারবেনা।"

-"না... এ হতে পারে না!"- প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে চন্দন। তারপর আবার জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে থাকে। তার মন্ত্রে আকাশে হঠাৎ মেঘ জমতে শুরু করে, প্রচণ্ড জোরে ছুটতে শুরু করে হাওয়া। মেঘে মেঘে খেলা করতে থাকে বিদ্যুৎ। আমি চিৎকার করে উঠি-" এইবার! এইবার! আর দেরি করোনা মা... সন্তানদের রক্ষা করো!"

পরমুহুর্তেই আমি দেখি রাধারানী ছুটে আসছে চন্দনের দিকে। তার চোখে প্রচন্ড আক্রোশের আগুন,হাওয়ায় উড়ছে তার খোলা চুল আর

তার হাতের খড়্গ যজ্ঞের আগুনের আলোয় বারংবার যেন চকচক করে উঠছে। একমুহূর্তের জন্য তাকে দেখলে মনে হবে স্বয়ং মা কালী যেন নেমে এসেছেন খড়্গ হাতে অসুরকে বিনাশ করার জন্য! চন্দন পিছনে ফিরে তাকাবার সময় পায় না আর, তার আগেই শুনতে পাই প্রবল আক্রোশে সঙ্গে গর্জে উঠে রাধারানীর শানিত খড়্গ। মুহূর্তের মধ্যেই যজ্ঞের আগুনের মধ্যে ছিটকে পরে চন্দনের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মাথাটা। আর তারপর দু একবার কেঁপে উঠে যজ্ঞের আসনেই উল্টে পড়ে যায় চন্দনের শরীরটা। আমি দেখি রাধারানীর তেজও ক্রমশ কমে আসছে। একসময় মাথায় হাত দিয়ে সে জ্ঞান হারায়।

আর ঠিক তার পরের মুহূর্তেই যজ্ঞ বেদীর মধ্যে একটা বিশাল বাজ পড়ে। আমি চোখ বন্ধ করে নিয়েছিলাম, চোখ খুলতেই দেখতে পাই সেই ভয়ংকর বজ্র ডাকিনী দাঁড়িয়ে আছে আমার চোখের সামনে। তার চোখে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। সে উন্মাদিনীর ন্যায় চিৎকার করে ওঠে... আর সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটানো শব্দে একসঙ্গে পাঁচটি বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায়। আমি প্রবল আশায় বুক বেঁধে নিজেই নিজেকে বলতে থাকি-" তার তো এসে যাওয়ার কথা এতক্ষণে... অনেক আগেই তো শিস দিয়ে দিয়েছি। এক...দুই...তিন...চার..."

-"আমি এসে গেছি ঠাকুর মশাই!"

নৃপতির গলা পেয়ে আমি বুকের মধ্যে যেন ভরসা ফিরে পাই! চিৎকার করে তাকে বলে উঠি-" এই যে! এই যে নৃপতি এই তোমার ফুলি! ওকে শান্ত কর! ওকে শান্ত করো! একমাত্র তোমার ভালোবাসাই পারবে ওকে শান্ত করতে!"

ইতিমধ্যেই বজ্র ডাকিনীকে দেখে নৃপতি আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিল। আমার কথা শুনে সে যেন সামান্য বল পায়। বজ্র ডাকিনীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে বলে-"ফুলি... আমার ফুলি..তোর এই অবস্থা কে করেছে? আমি নৃপতি! আমায় চিনতে পারছিস না ফুলি? ফুলি..."

বজ্র ডাকিনী আরেকবার চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আবারও একসঙ্গে অনেকগুলো বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে যায়।

-"এটা আমি ফুলি! এটা আমি! আমার কথা তোর মনে নেই? আমরা একসঙ্গে সেই ছোটবেলা থেকে খেলা করেছি, পুকুর পাড়ে মাছ ধরেছি, বৃষ্টিতে ভিজে আম কুড়াতে গেছি। তারপর এই তো সেদিন আমরা একে অপরের হাত ধরে কথা দিয়েছিলাম আমরা এই জীবনে একে অপরকে ছাড়া আর কাউকে কখনো ভালোবাসবো না। আমি তোর সঙ্গে বিয়ের কথা বাবাকে বলতে যেতামই...কিন্তু তার আগেই তো তুই আমায় ছেড়ে চলে গেলি! এই রুক্ষ,বদরাগী, মেজাজি মানুষটাকে তুই

ছাড়া আর কেইই বা ভালোবাসতে পেরেছিল ফুলি? সেই তুই যখন চলে গেলি...আমি আর পারিনি এ গাঁয়ে থাকতে...পালিয়ে গিয়েছিলাম কলকাতায়। এই গাঁয়ের সর্বত্র যে তুই আছিস ফুলি। তোকে যে আমি সবজায়গায় দেখতে পাই। আমায় এখনো চিনতে পারছিস না ফুলি? এখনো চিনতে পারছিস না?"- নৃপতির সেই বেদনার্ত আকুতিতে আমার বুকের ভেতরটাও মুচড়ে ওঠে। আমি দেখি বজ্র ডাকিনী ক্রমশ শান্ত হয়ে যাচ্ছে। তার শরীরের আগুনের শিখা ক্রমশ কমে আসছে। একসময় সে নীরবে এগিয়ে আসে নৃপতির দিকে। তারপর আমার চোখের সামনেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে দুজনে। ততক্ষনে বজ্র ডাকিনীর শরীরের সমস্ত আগুন নিভে গিয়েছে, সে আবার পরিণত হয়েছে ফুলিতে। তারপর চোখের নিমিষেই আমি দেখতে থাকি ফুলির সমস্ত শরীরটা আস্তে আস্তে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ ছাই হতে হতে একসময় ফুলির সমস্ত শরীরটা বাতাসে মিলিয়ে যায়, শুধু মাটিতে পড়ে থাকে এক মুঠো ছাইয়ের স্তুপ।

নৃপতি সেই ছাইয়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তারপর সেই ছাইয়ের স্তুপ থেকে একমুঠো ছাই হাতের মুঠোয় নিয়ে নিজের মুখে মাখতে মাখতে পাগলের মতো কাঁদতে থাকে সে। চিৎকার করতে থাকে ফুলি ফুলি করে। তার সেই সকরুণ কান্নার সুর মিশে যেতে থাকে নলহাটির অন্ধকার রাতের আকাশে। একসময় আমি এগিয়ে যাই

নৃপতির কাছে।তার মাথায় হাত রাখি,তারপর বলি-

-"কাঁদো... কাঁদো নৃপতি কাঁদো,কেঁদে নাও। এতদিনের যত দুঃখ, ক্রোধ, অভিমান আর অন্ধকার বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখেছ সব বের করে দাও। আজ এই রাত্রে মনুষ্যজীবনের সবথেকে বড় যেই রত্ন,সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার পবিত্র বিভূতিতে তোমার আত্মা পুণ্যত্ব লাভ করুক। আজ এই রাত্রি থেকেই তোমার এক নতুন জন্ম হলো।"

উপসংহার

-ব্যাস ওই রাত্রির পর নলহাটিতে আর কখনো বজ্র ডাকিনীকে দেখা যায়নি। ওই ঘটনার মাস তিনেক পরে শুনেছিলাম নৃপতি একদিন রাত্রে গোপনে গৃহ ত্যাগ করে। তাকেও আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাধারানীও সেই রাতের পর ক্রমশ ভালো হয়ে উঠেছিল।পরে সে শাড়ির ওপর নকশী করার কাজ শুরু করে। শুনেছিলাম সে কাজে সে বেশ নামডাক অর্জন করেছিল। সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা রাধারাণীর অবশ্য কিছুই মনে ছিলো না। ও একবার আমায় বলেছিল- "আপনি সে রাতে চলে গেলেন। আমি ঝোপে বসে রইলাম।তারপর হঠাৎ আমার কি যেন একটা হলো। মনে হলো আমার শরীরের মধ্যে কি একটা যেন ঢুকেছে! আপনি তো কোনো খড়্গ আমায় দেননি সেই রাতে,একটা কাটারী মতো দিয়েছিলেন। তাহলে সেই রাতে আমি

খড়্গটা পেলাম কি করে কে জানে! তারপর সেই রাতের আর কোনো ঘটনা আমার ঠিকঠাক মনেও নেই!"

-"সেই কথা মনে রাখার দরকারও বোধহয় নেই!"-আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলাম কথাটা। পরেরবছর ওর একটা ফুটফুটে পুত্রসন্তান হয়েছিল শুনেছিলাম, আমায় বলেছিল একবার গিয়ে কুন্ডলী করে দিতে কিন্তু সময়াভাবে আর যেয়ে ওঠা হয়নি।

তারানাথ থামল। বাইরের বৃষ্টিও ইতিমধ্যে থেমে এসেছে। আমি আর কিশোরী একবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে এবার উঠে দাঁড়ালাম, তারপর বললাম -" এইজন্যই আপনার কাছে বারবার আসি। আজ অনেকটা দেরি হয়ে গেল গল্প শুনতে শুনতে কিন্তু গল্পটা জব্বর ছিল। পরের দিন এইরকমই আরেকটা চাই কিন্তু!"

-"আবার গল্প বলে! বলেছি না তারানাথ তান্ত্রিক কখনো বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে না! সে যা বলে সব একশো ভাগ সত্যি!

-"হ্যা... হ্যা... ওই হলো। আজ চললাম তাহলে!"-এই বলে আমি আর কিশোরী বাইরে বেরিয়ে এলাম। সদ্য বৃষ্টি শেষ হওয়ার পরের অতি মনোরম ঠান্ডা হাওয়া আমাদের গায়ে এসে লাগলো,সেই হাওয়ায় মনটা জুড়িয়ে গেল যেন। ট্রাম রাস্তার দিকে এগোতে এগোতে কিশোরীকে

জিজ্ঞেস করলাম-" কি সবটা বিশ্বাস হলো?"

কিশোরী হেসে উত্তর দিলো-" বিকেলটা দারুন কাটল!"

(সমাপ্ত)

শেষ পৃষ্ঠা

Original Post Link

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

Join us as a Volunteer to proofread and make amazing epubs from books you love.

আরও বই

টেলি বই

টেলি বই MOBI

PDFs on বর্ণপরিচয়